অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৭ মার্চ ২০১০ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা

email: jatyabarta.jumma@gmail.com

সওয়াল জবাব

"আমি বাঘাইছড়ি পরিদর্শন করে এসেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার প্রশ্ন, অসহায় মানুষের ঘরবাড়ি কেন পোড়ানো হলো। কেন রক্ষা হলো না তাদের সহায় সম্পদ। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে।": খাগড়াছড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। (প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০)

- চোখ থাকতে অন্ধ হলে খুঁজে বের করবেন কিভাবে? হামলাকারীরা তো সাজেকে আপনার সাথেই ছিলো।

সাজেকে জান্তব হিংস্রতা, হিংসার দাবানল

রাঙ্গামাটি জেলার সাজেকে আবার বর্বর হামলা হয়েছে। শহীদ দিবসের একদিন আগে ২০ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে কমপক্ষে দুই গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৪ জন। সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সর্বশেষ হিসাব মতে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ২ জন। ধারণা করা হয় তাদের লাশ গুম করা হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারী রাত থেকে পরদিন বিকেল ১।৩০টা পর্যন্ত চলা এই সেনা-সেটলার যৌথ হামলায় ১১টি গ্রামের প্রায় ৫০০ ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়।

এই মধ্যযুগীয় হামলার প্রতিবাদে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের ডাকে ২৩ ফেব্রুয়ারী শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ চলাকালে খাগড়াছড়ি শহরে একটি মিছিলে হামলা ও মহাজন পাড়া, মিলনপুর ও সাতভেইয়া পাড়াসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ৫৭টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। হামলাকারী সেটলাররা পাহাড়িদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর করে। সাতভেইয়া পাড়ায় জনতা প্রতিরোধ করলে আলোয়ার হোসেন নামে হামলাকারীদের একজন পালিয়ে যাওয়ার সময় আগুনে পুড়ে মারা যায়।

খাগড়াছড়িতে তান্ডবলীলা

ঘটনার সূত্রপাত:

সাজেকের বাঘাইহাটে ভূমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। এ নিয়ে আন্দোলন, বাজার বয়কট ও পাল্টা অবরোধ ইত্যাদি চলতে থাকলেও ঘটনার সূত্রপাত ১৯ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা থেকে। সে দিন দিঘীনালার কল্যাণ চাকমা ও তার সঙ্গীকে স্কুটার যোগে বাঘাইহাট থেকে ফেরার সময় বাঘাইহাটের ১০ নং এলাকায় হামলা করা হয়। এরপর রাত ৮টার দিকে গঙ্গারাম দোর ও রেতকাবা গ্রামে পাহাড়িদের বাড়ি ঘরে আগুন দেয়া হয়। এতে ৩০-৩৫টি ঘর পুড়ে যায় ও দেবেন্দ্র চাকমা নামে একজনকে হামলাকারীরা ধরে নিয়ে যায়। হামলাকারীদের সাথে ৬ গাড়ি আর্মি ছিল বলে এলাকাবাসীরা জানায়। হামলার আগে এদিন দুপুরের মধ্যে দীঘিনালা, মেরুং ও মারিশ্যার বিভিন্ন এলাকা থেকে সেটলারদের নিয়ে এসে গঙ্গারাম দোরে জড়ো করা হয়।

পরদিন সকালে পালিয়ে যাওয়া পাহাড়িরা গ্রামে ফিরে আসে এবং তাদের পোড়া ঘরবাড়ি দেখতে পায়। এদিন সকাল সাড়ে দশটায় বাঘাইহাট জোনের সিও (কমান্ডিং অফিসার) ৩ গাড়ি আর্মি নিয়ে আবার গঙ্গারাম দোরে যায় এবং পাহাড়িদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু পাহাড়িরা তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। সোয়া এগারটার দিকে বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও সেখানে যান। তার আগমণের সাথে সাথেই আর্মিদের সাথে থাকা

পৃষ্ঠা পাঁচায় দেখুন

১ম বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৭ মার্চ ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

ঢাকায় সাজেকবাসীর সংবাদ সম্মেলন

সেনা সদস্যরা ফায়ার করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, সেটলাররা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়

রাঙামাটির বাঘাইহাটে সেনা ও সেটলার হামলার প্রতিবাদ ও ৬ দফা দাবিতে ১ মার্চ সোমবার সকাল সাড়ে এগারটায় ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স রুমে নিহত বুদ্ধপতি চাকমার মেয়ে লেজহুলি চাকমা (সুমিতা)সহ ক্ষতিগ্রস্তদের একটি দল সংবাদ সম্মেলন করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক জ্ঞানেন্দু চাকমা লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলেন, নিহত দু'জন বুদ্ধপতি চাকমা (৩১) ও লক্ষী বিজয় চাকমা (২৪) সেনা গুলিতে নিহত হয়েছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি গুচ্ছগ্রাম বা লোয়াপাড়ায় সেনা সদস্যরা প্রথমে ফায়ার করে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তার পর পরই সেটলাররা বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় ও লুটপাট চালায়। ২০ ফেব্রুয়ারি বাঘাইহাট সেনা জোন থেকে রীতিমত মাইকিং করে হামলার উদ্দেশ্যে সেটলারদের জড়ো করা হয়। আর পাহাড়িদেরকে গ্রাম ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। সেনা-সেটলার যৌথ হামলায় ২টি বৌদ্ধ বিহার, ১টি গির্জা সহ ১১টি পাহাড়ি গ্রামের ৫ শতাধিক বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ঘটনার এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও সরকারিভাবে তদন্ত কমিটি গঠিত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সরকারের কাছে ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো ১। অবিলম্বে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী হামলার সাথে জড়িত সেনা সদস্য ও সেটলারদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান, ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ২। ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, ৩। আগুনে ভস্মীভূত ২ টি কিয়াঙ (বৌদ্ধ বিহার) ও ১টি গির্জাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সরকারি খরচে পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ৪। বিনা অপরাধে আটককৃত পাহাড়িদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান এবং পাহাড়ি গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা।

৫। বাঘাইহাট সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং সেটলারদের সাজেক থেকে সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন, সেনাবাহিনীর নির্যাতন, হয়রানি, বাড়িঘরে তল্লাশি ও হুমকি প্রদান বন্ধ করা। ৬। ভূমি বেদখল বন্ধ করা ও বেদখলকৃত জমি ফেরত দান।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিহত বুদ্ধপতি চাকমার মেয়ে লেজহুলি চাকমা (সুমিতা), সাজেক নারী সমাজের সদস্য সচিব নিরূপা চাকমা, জ্যোতি লাল কার্বারী (গঙ্গারাম), চিত্র রঞ্জন কার্বারী (লোয়াপাড়া বা গুচ্ছগ্রাম) সহ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ জন। দলে ছিলেন ৮ নারী ও ৭ পুরুষ।

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রামে টানা বিক্ষোভ

রাঙামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নের ১১টি পাহাড়ি গ্রামে ও খাগড়াছড়ি শহরে সেনা-সেটলার হামলা, খুন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতিদিন বিক্ষোভ চলছে।

ঢাকাঃ ২০ ফেব্রুয়ারী ইউপিডিএফ-যুক্ত সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিক্ষোভ করে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, বাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, নাগরিক সমাজ, পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ, ১১দল, ঢাকাস্থ ছাত্র-যুব-জনতাসহ আরো অনেক সংগঠন।

চট্টগ্রামঃ বন্দর নগরী চট্টগ্রামেও সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী ইউপিডিএফ-যুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সাজেক হামলার প্রতিবাদে প্রেস ক্লাবের সামনে প্রথম সমাবেশ করে। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম যৌথভাবে, ২৪ ফেব্রুয়ারী জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ২৫ ফেব্রুয়ারী পাহাড়ি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ২৬ ফেব্রুয়ারী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, জাতীয় গণতান্ত্রিক মঞ্চ ও ইউপিডিএফ যৌথভাবে, পাহাড়ি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা, ২৭ ফেব্রুয়ারী পাহাড়ি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও পাহাড়ি শ্রমিক পরিষদ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী সম্প্রীতি পরিষদ চট্টগ্রামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই বিক্ষোভ সমাবেশে বাঘাইছড়ির সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষী সেনা সদস্য ও সেটলারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়। এছাড়া ঘটনা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও ভূমি বেদখল বন্ধের দাবিও জানানো হয়।

এছাড়া বেশ কিছু সংগঠন ও বিশিষ্ট নাগরিক ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নাগরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছে।

অপরদিকে, মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ১ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি করা হয়েছে। "সরকারের নিস্পৃহ আচরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং ঘটনার সঙ্গে সেনাবাহিনী জড়িয়ে পড়ায় সেখানকার পরিস্থিতি বিপজ্জনক মোড় নিয়েছে।"

সাজেক হামলায় জড়িতদের কয়েক জন

সাজেকে ২০ তারিখের হামলার সাথে জড়িত কয়েকজনকে চেনা গেছে। এরা হলো ১। সোলায়মান-এর ভাই মালেক ২। হানিফ পীং ফরেস্টগার্ড রফিক ৩। বাদশা বয়স ২৮ (ইউপি কাউন্সিলের ফাড়-দার) পীং আজিজ কসাই নোয়াখালী থেকে ৪। কাসেম (গাড়ি লাইনম্যান) ৫। আনোয়ার বয়স ৩২ পীং জলিল (রাঙ্গুনীয়া থেকে) ৬। ওসমান বয়স ২৭ পান দোকানদার (রাঙ্গুনীয়া থেকে) ৭। ফরিদ বয়স ৪২ হোটেল ব্যবসায়ী রাঙ্গুনীয়া থেকে ৮। তোফাজ্জল বয়স ৩০ চাষা ৯। সেলিম বয়স ৩০ ভিডিপি সদস্য ১০। তার (সেলিমের) ভাই কাসেম ভিডিপি সদস্য ১১। বাবুল বয়স ৩০ কুমিল্লা থেকে ১২। খোকন কার্পেন্টার পীং তফাজ্জল (ময়মনসিং থেকে) ১৩। আবু বকর বয়স ৩৩ পীং নাসির আলি ময়মনসিং থেকে ১৪। জামাল বয়স ৩৫ ময়মনসিং থেকে ১৫। মুনীর পীং আবু বকর ১৬। মোঃ আলী বয়স ২৬ পীং নওশের আলী (আর্মিদের সোর্স ও লাদুমনি চাকমার হত্যাকারী) ১৭। ডা. শাজিমউদ্দীন, ফার্মেসী দোকানদার ও বাজার সেক্রেটারী, (সিলেট থেকে)।

হামলায় অংশ নেয়া আর্মিদের কয়েকজনের নামঃ ১। লেঃ কঃ ওয়াসিম, সিও, বাঘাইহাট জোন ২। টু-আই-সি মেজর জুলফিকার (আগে দুর্নীতি দমন কমিশনে ছিলেন বলে তিনি দাবি করেন), বাঘাইহাট জোন ৩। তরিকুল, হাবিলদার ৪। রেজাউল, হাবিলদার ৫। মুরুল, নায়েক সুবেদার বা ওয়ারেন্ট অফিসার।

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা পূর্বপরিকল্পিত

সত্য কখনো গোপন থাকে না। সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়িদের ওপর হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এক জঘন্য ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। "পাহাড়ে ফের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর পাঁয়তারা। ধর্মান্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠির মদদ" শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে ১৩ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়ি থেকে জীতেন বড়ুয়া ও ওমর ফারুক শামীম-এর লেখা উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, "পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বিনষ্টে একটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটাতে নানামুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে একটি বিশেষ মহল।"

এই ষড়যন্ত্রের সাথে কারা জড়িত সে সম্পর্কে তারা জানায় "গত কয়েকদিনে দীঘিনালা উপজেলার মারিশ্যা এলাকায় বেশ ক'টি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে খাগড়াছড়ি জেলা শহরের বেশ ক'জন বাঙালী ছাত্র পরিষদ নেতা (জামায়াত শিবির কর্মী), দীঘিনালা এবং বাঘাইহাট ও মারিশ্যার বাঙালী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। গোপন সূত্রের খবরে জানা যায়, বৈঠকটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সূতিকাগার খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটাতে নেতাকর্মীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনার বৈঠক ছিল।"

তারা আরো জানায়, "বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হতে যে কোন সময়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ষড়যন্ত্রকারী দলটির ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। বিরোধপূর্ণ এলাকাগুলোতে ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় বিশেষভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেলার যে ক'টি স্থানে পাহাড়ী বাঙালীদের মাঝে ভূমি বিরোধ আছে এমন কয়েকটি এলাকায় সাধারণ বাঙালীদের ভূমি দখলে নিতে চলছে উদ্বুদ্ধকরণ, (যাতে সংঘাত অনিবার্য)। খালি জায়গায় নতুন বসতিস্থাপন, তুচ্ছ ঘটনা সৃষ্টির মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে নিয়োজিত আছে স্থানীয় মানুষকে নিয়ে বিশেষ দল। এভাবেই চলছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিকল্পনা। যে কোন সময় যে কোন ঘটনাকে পুঁজি করে মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ এই দাঙ্গা সৃষ্টিতে প্রস্তুত রয়েছে উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনটির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা।"

সরকার এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, "খাগড়াছড়ি আসনের সংসদ সদস্য ও শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যে কোন মূল্যে এসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।"

এখন একটাই প্রশ্ন সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কেন ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আগাম ব্যবস্থা নেয়নি? তাহলে তারাও কি এ ধরনের একটি দাঙ্গা চেয়েছিল? তা না হলে সরকার ও প্রশাসনের নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকার অর্থ কি? এক কথায় সরকার কোন ভাবেই তার দায় এড়াতে পারে না।

সেনাবাহিনীর বক্তব্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়, দোষী সেনা সদস্যদের শাস্তি দিতে হবেঃ ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি ইউনিটের সংগঠক শান্তি দেব চাকমা আজ, ২১ ফেব্রুয়ারী, এক বিবৃতিতে সাজেক ঘটনা সম্পর্কে দেয়া সেনাবাহিনীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

"সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর ওপর গুলি চালালে আত্মরক্ষার জন্য সেনাসদস্যরা তিনটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। বাকি গোলাগুলি কারা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি" খাগড়াছড়ি রিজিয়নের অধিনায়ক জেনারেল এম এম সালেহীন-এর এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে শান্তি দেব চাকমা বলেন তার বক্তব্য সত্যের অপলাপ ও বিভ্রান্তিমূলক। সেনাবাহিনীর সদস্যরা কেবল গঙ্গারামে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েনি, পাহাড়িদের গ্রাম "গুচ্ছগ্রামে" ঢুকেও নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে ও বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে।

তিনি বলেন জেনারেল সালেহীন "বাকি গোলাগুলি কারা করেছে তা নিশ্চিত" হতে না পারলেও এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, ঘটনার সময় অস্ত্রধারী একমাত্র সেনাসদস্য ও পুলিশের লোকজনই উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তারা ছাড়া অন্য কারোর গোলাগুলি করার প্রশ্নই আসে না।

"ইউপিডিএফ নামক একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় গঙ্গারাম ও বাঘাইহাটের বাঙালিদের বসতবাড়ি সরিয়ে চলে যেতে এবং বাঘাইহাট সেনাবাহিনীর জোন প্রত্যাহার করতে দাবি জানিয়ে আসছিল। সে দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে তারা দফায় দফায় সেনা টহল অবরুদ্ধ করেছিল।" (দৈনিক যায় যায় দিন) সেনাবাহিনীর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শান্তিদেব চাকমা বলেন গত জরুরী অবস্থার সময় থেকে সেখানে সেনাবাহিনী সেটলারদের নিয়ে এসে পাহাড়িদের জমি বেদখল শুরু করে। পাহাড়িরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। তারা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে "সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি" ও "সাজেক নারী সমাজ" গঠন করেন। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও আন্দোলনের প্রতি ইউপিডিএফ-এর অবশ্যই সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এই দুই সংগঠনের নেতারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আন্দোলনের কলাকৌশল ও কর্মসূচি ঠিক করে থাকেন। এর সাথে ইউপিডিএফ-এর সম্পর্ক নেই।

অপরদিকে, সেনা টহলকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগও সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃত সত্য হলো, সেনা সদস্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার সময় সাজেকের নারীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন ও সেনাদের বিভিন্ন নির্যাতন ও হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

শান্তি দেব চাকমা অভিযোগ করে বলেন, ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং সাংবাদিকরা যাতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে না পারে সে জন্য সেটলারদের উত্তেজিত করে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে ও ঘটনাস্থলে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে। তিনি ২০ ফেব্রুয়ারী ঘটনাস্থলে যাওয়ার সময় "সমকাল" ও "প্রথম আলোর" স্থানীয় প্রতিনিধিদের ওপর হামলার নিন্দা জানান।

শান্তি দেব চাকমা সাজেক ঘটনাকে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত গণহত্যা আখ্যায়িত করে বলেন, এ হামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী সেনা সদস্য ও সেটলারদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া তিনি আহতদের সুচিকিৎসা, ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুড়িয়ে দেয়া গীর্জা ও বৌদ্ধ বিহার পুনর্নির্মাণের দাবি জানান।

তিনি থানা হেফাজতে রাখা নিরীহ ৭ গ্রামবাসীকেও অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০॥ হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য ইউনিয়ন ফর ফরেন এফেয়ার্স এন্ড সিকিউরিটি পলিসি ও কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাথারিন এশটন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনা সম্পর্কে ২৬ ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতি দেন। নিচে তা হুবহু ছাপা হল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জানতে পেরেছে যে, রাঙ্গামাটি জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামে এবং প্রধানত বাঘাইহাটের গঙ্গারামদোর বেশ কয়েকজন পাহাড়ি নিহত হয়েছেন, এলাকায় তাদের ৪০০ ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং একই সংখ্যক পাহাড়ি পরিবার উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন। ইইউ এ ব্যাপারে অবগত যে এই ঘটনার সাথে সেনা সদস্যরা ও তাদের দ্বারা নিয়োজিত শ্রমিকরা জড়িত।

এই ঘটনা ও এতে সেনা সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে এর দ্রুত ও সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি করার জন্য ইইউ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। ইইউ এই লজ্জাজনক ঘটনার সংঘটনকারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। উদার ও সহনশীল সমাজে এ ধরনের ঘটনার স্থান হতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির উপর এই সহিংস ঘটনা যে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে সে ব্যাপারে ইইউ উদ্বিগ্ন। তাই ইইউ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল ও Jumma Peoples Network UK-এর স্মারকলিপি

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল-এর ডিরেক্টর স্টিফেন কোরি ও Jumma Peoples Network UK -এর মুখপাত্র লাল আমলাই সাঙ্গেক হামলার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। নিচে তা অনুবাদ করে ছাপা হল।

"উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘাইহাড়িতে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনায় Jumma Peoples Network UK ও Survival International অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

বিশ্বস্ত সূত্রগুলো বলেছে যে, ২০ ফেব্রুয়ারী শনিবার পাহাড়ি ও বাঙালি সেটলারদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আর্মিরা গুলি চালালে এতে কমপক্ষে ৬ জন পাহাড়ি মারা যান। একজন সৈন্যসহ অনেকে আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিরোধ থেকে উক্ত সহিংসতার উৎপত্তি এবং এরপর সেটলাররা সাঙ্গেকে পাহাড়িদের দুই শতাধিক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনটি বৌদ্ধ বিহার ও একটি গীর্জাও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিদেশে আন্তিসংঘের শান্তি মিশনে ইতিবাচক সুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। পাহাড়ি জনগণকে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন এবং তাদের বাড়িঘর পোড়ানো ও তাদের জমি কেড়ে নেয়ার ঘটনা এখনো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে রয়েছে।

আমরা জরুরী ভিত্তিতে বাঘাইহাড়ি ঘটনার তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আপনার সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আর দেরী না করে পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়ার জন্য আপনার সরকারকে অনুরোধ করছি। আমরা বিশ্বাস করি আপনার সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হলে সেখানে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে।

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস

নতুন দিল্লী ভিত্তিক এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (এসিএইচআর) ২০ ফেব্রুয়ারী সাঙ্গেকে পাহাড়ি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া ও নির্বিচারে পাহাড়ি হত্যার জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার নভি পিল্লাই-এর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

সংগঠনটি ২০ ফেব্রুয়ারী দেয়া এক বিবৃতিতে জানায় বাংলাদেশ আর্মির গুলিতে তিন জন পাহাড়ি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন অনেক এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিখোঁজ রয়েছেন। কমপক্ষে চারটি গ্রাম পুড়ে ছাই হয়েছে।

বাংলাদেশ আর্মির সদস্যরা ব্যারিকেড দিয়েছে এবং জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদেরকে ঐ এলাকা সফরে বাধা দিচ্ছে।

সংগঠনটির পরিচালক সুহাস চাকমা বলেন, এই একটি

আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিবৃতি

হামলায় প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশ সরকার পাহাড়িদের জমি দখল করে সমতলের বেআইনী সেটলারদের বসিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে নির্বিচারে হত্যার নীতি পরিবর্তন করতে পারেনি।

তিনি আরো বলেন, এ বছর জানুয়ারীর শুরু থেকে সমতলের বেআইনী সেটলাররা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় চাকমাদের গ্রামে বেআইনী বসতিস্থাপন পুনরায় শুরু করে। তারা পাহাড়ি গ্রামবাসীদের জমি জোরপূর্বক দখল করে বেশ কয়েকটি ঘর নির্মাণ করেছে।

সাঙ্গেক ভূমি রক্ষা কমিটির ব্যানারে পাহাড়ি গ্রামবাসীরা গত ১০ জানুয়ারী বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে যাতে ১৬ জানুয়ারীর মধ্যে তাদের

জাতিসংঘ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে

২ মার্চ ২০১০॥ জাতিসংঘ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। গত ২ মার্চ জাতিসংঘের নিউজ সেন্টারের ওয়েব সাইটে এ কথা বলা হয়েছে।

"বাংলাদেশে নিয়োজিত জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যেখানে সম্প্রতি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মধ্যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে; জাতিসংঘ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দিতে প্রস্তুত রয়েছে। জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র আজ এক কথা বলেছেন।

"সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট মতে, এক সপ্তাহ আগে মুসলিম সেটলার ও বৌদ্ধ পাহাড়িদের মধ্যে শুরু হওয়া সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন। তাছাড়া, কয়েক শত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ও হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়েছেন।

"জাতিসংঘ 'আশা করে দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে শান্তির চেতনা নিয়ে এই ট্র্যাজেডি থেকে উত্তরণের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হবেন' জাতিসংঘের মুখপাত্র মার্টিন নেসির্কি নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

"তিনি বলেন, 'জাতিসংঘ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দিতে সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।'"

জমি ফিরিয়ে দেয়ার আলটিমেটাম দেয়া হয়। কোন ফল ছাড়া এই সময়সীমা পার হলে পাহাড়িরা তাদের বিক্ষোভ শুরু করবে এবং ১৮ জানুয়ারী থেকে বাঘাইহাট বাজার বয়কট করতে থাকেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা সমতলের বেআইনী সেটলারদের বসতি বুকি করতে গত রাত থেকে পাহাড়িদের গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া শুরু করে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল

২৬ ফেব্রুয়ারী॥ খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল ২০ ফেব্রুয়ারী আর্মির গুলিতে দুই পাহাড়ি নিহত হওয়ার ঘটনার তদ্বিৎ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

সংগঠনটি বলেছে যদিও সরকার দুই ব্যক্তির মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছে, স্থানীয়দের ভাষ্য মতে কমপক্ষে ৬ জন পাহাড়ি মারা গেছেন, তবে তাদের লাশ উদ্ধার করা যায়নি।

যে শত শত পাহাড়ি তাদের বাড়িঘরে সেটলার হামলার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন নিহত উক্ত দুই ব্যক্তি তাদের সাথে ছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী রাতে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি এলাকায় সেটলাররা পাহাড়িদের কমপক্ষে ৪০টি বাড়িতে আগুন দেয়ার পর তারা নিরাপত্তার দাবি করছিলেন। পাহাড়িরা তাদের জমিতে সেটলারদের অবৈধ ঘর নির্মাণে বাধা দিলে হামলা শুরু হয়। রিপোর্ট মতে, বাঙালি সেটলাররা পাহাড়িদের বাড়িঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে হামলা চালায় এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

তার পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারী পাহাড়িরা তাদের গ্রামে এসে সেটলারদের হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তা বন্ধ করতে যায়। একজন আর্মি কমান্ডার পাহাড়িদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে, কিন্তু তারা তা অমান্য করে। একজন বিক্ষোভকারী ছুরি দিয়ে ওই সেনা অফিসারকে আহত করে বলে দাবি করা হয়েছে। আর্মিরা এরপর বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন ও পরে মারা যান। কমপক্ষে ২৫ ব্যক্তি এ গুলির ঘটনায় আহত হন। পাহাড়িরা ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সেটলারা তাদের কমপক্ষে ১৬০টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। সেনারা তাদেরকে কোন ধরনের বাধা দেয়নি।

শতাধিক পাহাড়িকে আটক করা হয়েছে এবং বেশ কয়েক ডজন লোক নিখোঁজ রয়েছেন। আত্মীয়রা তাদের পরিবারের সদস্যদের খুঁজতে পুলিশ স্টেশনে কিংবা আর্মি পোস্টে যেতে ভয় পাচ্ছেন। ফলে নিখোঁজদের ব্যাপারে তাদের তথ্য নেই। রিপোর্ট মতে, আটককৃতদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা হামলার পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদেরকে হাসপাতালে যেতে দেয়া হয়নি বরং হেফাজতে নেয়া হয়। পুলিশ আনুমানিক ৩০ জন সেটলারকে গ্রেফতার করেছে বলে কথিত আছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল যে সব ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য এই হামলা ও হত্যার তদ্বিৎ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল আটককৃতরা যাতে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে পারে, তাদের আটকের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে ও পরিবারের লোকজন তাদের সাথে দেখা করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতেও বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে। আটককৃতদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করাও জরুরী।

তাছাড়া, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল চায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক এবং যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে পুনর্বাসন করা হোক।

মিজোরামে সিএডিসি সভায় নিন্দা

মিজোরামের চাকমা সম্প্রদায় সাঙ্গেকে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়ি হত্যার নিন্দা জানিয়েছে। চাকমা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (সিএডিসি) সর্বোচ্চ সভায় গত মঙ্গলবার, ২ মার্চ, এ নিন্দা প্রস্তাব পাস হয়। সেন্ট্রাল ইয়ং চাকমা এসোসিয়েশন সিএডিসি'র রাজধানী কমলানগর-এ অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করে। এতে জমি সংক্রান্ত জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়িদের হত্যার নিন্দা জানানো হয়।

উক্ত সভায় সাঙ্গেকবাসীর প্রতি সংহতি জানাতে ৪ মার্চ মিজোরামে শান্তিপূর্ণ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারা ঐ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর কাছে একটি স্মারকলিপিও পাঠাবেন। এতে তারা ড. সিংকে অনুরোধ জানাবেন যাতে তিনি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাঙ্গেক হামলা বিষয়ে কথা বলেন।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লেখা লরী ফার্গুসন এমপি'র লেখা চিঠি

রিড অঞ্চলের ফেডারেল এমপি লরী ফার্গুসন তার দেশ অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও সংসদের ডেপুটি লিডার স্টিফেন স্মিথ এমপি-কে ২৩ ফেব্রুয়ারী লেখা এক চিঠিতে সাঙ্গেক হামলা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

তিনি লেখেন, "আমি ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংলাপ ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠির অব্যাহত দুরাবস্থা সম্পর্কে আপনাকে লিখেছিলাম। আমি আমার কাজের সুবাদে সিডনির অনেক অনুষ্ঠানে ও আমাদের Foreign Aid ফলারশিপ স্কিম-এ আদিবাসী অধিকার সম্পর্কিত সভায় উপস্থিত থেকেছি।

আশা করা হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতারোহণের ফলে ছাবিং-হওয়া শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নে নতুন গতি আসবে। সে কারণে সাঙ্গেকের বাঘাইহাটের ঘটনার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে; সাম্প্রতিক এ ঘটনায় ৬ জন স্থানীয় পাহাড়ি সেনাদের দ্বারা নিহত হয়েছেন।

এছাড়া শত শত ঘরবাড়ি জ্বালানের খবরও পাওয়া গেছে। এটা ঘটছে অব্যাহত বেআইনী অভিবাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এই অভিবাসনের কারণে জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন হচ্ছে, ভূমি বেদখল হচ্ছে এবং স্থানীয়দের বসবাসের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

আমি অনুরোধ করবো অস্ট্রেলিয়ার সরকার এ ঘটনাগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরাসরি কথা বলুক এবং কার্যকরী বহুপাক্ষিক সভায় আলোচনা করুক।"

১ম বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৭ মার্চ ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

সম্পাদকীয়

১ম বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৭ মার্চ ২০১০

সাজেক-খাগড়াছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ ঃ সরকার-জনপ্রতিনিধি ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

১৯-২০ ফেব্রুয়ারি সাজেকের বাঘাইহাট ও ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সংঘটিত হামলা-খুন-ধ্বংসযজ্ঞ-- সাধারণ মানুষকে আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, 'হাকিম নড়েছে, হুকুম নড়েনি', সরকার বদল হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে নীতির পরিবর্তন হয়নি। বিএনপি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পালা শেষ করে ক্ষমতায় বসেছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু 'অপারেশন উত্তরণ' জারি আছে, প্রত্যক্ষ সেনা মদদে সেটেলার লেলিয়ে দিয়ে পাহাড়িদের ভূমি বেদখল, হামলা, নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ অভিযান ইত্যাদি অব্যাহত আছে।

সাজেক-খাগড়াছড়িতে এত ধ্বংসযজ্ঞের পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তিন এমপি ঘটনার নিন্দা, নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ, নিরপরাধ ব্যক্তিদের হয়রানি-ধরপাকড় বন্ধ ও এলাকাবাসীদের জানমাল রক্ষার্থে আনুষ্ঠানিক যুক্ত বক্তব্য-বিবৃতি দেননি। তারা কেউ জনগণের পক্ষে দৃঢ়তার সাথে কথা বলছেন না। বরং সরকারি ভাষ্যই প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডার-এ সাজেক-খাগড়াছড়ির ওপর কথা বলতে চেয়েছেন এমন তথ্য জানা যায়নি। জনগণের প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত থেকে একাত্মতা প্রকাশ দূরে থাক, সংসদের বাইরে নিজেরা কিছু করবেন বা করতে উদ্যোগী হবেন-- তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ তিন এমপিই একই দলভুক্ত, জনগণের পক্ষে তাদের যুক্ত বিবৃতি সরকার আমলে নিতে বাধ্য হত। তাদের বক্তব্য দিতে না দিলে তারা সংসদের অধিবেশন বয়কট কিংবা নিজ নিজ সরকারি দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করলে বোঝা যেত জনগণের পক্ষে কাজ করতে না পারলেও অন্তত তারা জনগণের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। বাস্তব ঘটনা বারে বারে এটাই প্রমাণ দিচ্ছে যে, সরকারি দলে থেকে সরকারের নীতি-সিদ্ধান্তের বাইরে কোন বক্তব্য সাংসদরা দেন না, 'স্বার্থের খাতিরে দিতেও পারেন না। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা পক্ষে কথা বলার জন্য তারা সাংসদ হন না, তারা সাংসদ হন জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে, তাদের কাছে এটি হচ্ছে অর্থ-বিত্ত উপার্জনের মাধ্যম বিশেষ। দলীয় স্বার্থের বাইরে কিছু বলতে বা করতে গেলে তাদের ভয় থাকে সদস্য পদ হারানোর। কিন্তু তাদের দলীয় স্বার্থ আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী।

সরকারি দলে থেকে এলাকায় জনগণের সপক্ষে বড় ভূমিকা রাখতে পারার কোন নজীর আজ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জাতীয় পার্টি--যে দল থেকেই সাংসদ হোন, তিনি পূর্ণমন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী বা উপদেষ্টা যে মর্যাদারই হোন, সাধারণ পার্বত্যবাসীদের দুর্যোগের মুহূর্তে তারা কিছু করতে সক্ষম হন না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় বার সরকার গঠন করে এ সত্য আরও একবার প্রমাণিত হল। ভবিষ্যতেও কেউ উপরোক্ত দলে যোগ দিয়ে জনগণের পক্ষে কিছু করতে চাইলে ফলাফল একই হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নীতি আদর্শ ভিত্তিক সংগঠন এবং জনগণের প্রকৃত বন্ধু ।

সাধারণভাবে সরকারি দলের সাংসদরা ক্ষমতাবান মহা প্রতাপশালী হলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি দলভুক্ত পাহাড়ি সাংসদরা এ দিক দিয়ে ভীষণ রকমের ব্যতিক্রম। সরকারি দলভুক্ত হয়েও তারা সরকারি ক্ষমতার অধিকারী নন, স্থানীয় প্রশাসনেও তাদের কর্তৃত্ব থাকে না। সরকারি উচ্ছিষ্ট লাভের অধিকারী হন মাত্র। জেলা প্রশাসক, টিএনও, এসপি বা ওসি চলেন স্থানীয় সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশে। সরকারের নীতি নির্ধারণে তাদের মতামতেরও কোন গুরুত্ব আছে তার প্রমাণ মেলে না।

'সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের' ঢাকঢোল পেটালেও, আসলে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হচ্ছে ক্ষমতাবানদের প্রচার মাধ্যম। দেশের স্বার্থের (?) ধুয়ো তুলে সংবাদ মাধ্যমের ওপর জারি থাকে সরকারি সেন্সরশিপ। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক ধ্বংসযজ্ঞের আসল চিত্র প্রকাশ না পাবার পেছনে জনমনে সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নবোধক হয়ে দেখা দিয়েছে। রিপোর্টিংয়ে সুকৌশলে আসল ঘটনা চেপে দিয়ে সরকার-সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রচার চালানো হয়েছে। উদোর পিন্ডি বুঁদোর ঘাড়ে চাপিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি আর প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করা হয়েছে।

২০ ফেব্রুয়ারি বলতে গেলে সমস্ত টিভি চ্যানেলেই বাঘাইহাট সেনা জোনের কাছে প্রচন্ড গোলাগুলির দৃশ্য বারে বারে দেখানো হয়। বাঘাইছড়ির টিএনও যুদ্ধক্ষেত্রের এক "সাহসী" সংবাদদাতার মত মোবাইল ফোনে দু'পক্ষের গোলাগুলির দৃশ্যের ধারা বর্ণনা দেন। খাগড়াছড়ির ব্রিগেড কমান্ডার আত্মরক্ষার্থে বাঘাইছড়ি জোন থেকে মাত্র "তিন রাউন্ড" ফায়ারের কথা প্রেস ব্রিফিং-এ স্বীকার করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ক্ষতিগ্রস্তদের ভাষ্যমতে ব্রাশ ফায়ার করেছিল সেনা সদস্যরাই, ঘটনাস্থলে তারাই ছিল একমাত্র সশস্ত্র দল। গোলাগুলির নাটক মঞ্চস্থ করে এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের মত তারা চেয়েছিল একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা জায়েজ করা আর অন্যদিকে পাহাড়ি জনগণের মনে ভীতি সঞ্চার করে এলাকাছাড়া করা। তারপর তাদের জমি বেদখল করে সেটেলারদের পুনর্বাসন করা। #

সাজেক ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না

তানভীর মোকাম্মেল

নয়টা গ্রাম পুড়েছে। ৩০০ আদিবাসী পরিবারের দেড় হাজার নারী-পুরুষ-শিশু ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে (এর মধ্যে নারীও রয়েছেন), তবে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা সাত বলে আক্রান্ত গ্রামের লোকজন দাবি করেছেন। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ ছয়জন নিখোঁজ! আরও ভয়াবহ সংবাদ হলো, বেতকাপা (বেতকাবা) থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব বটতলী পর্যন্ত সড়কের দুই পাশের সব বাড়িই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মেরুদন্ড দিয়ে এক শিরশিরে অনুভূতি বয়ে যায়। আমরা কি ১৯৭১-এর কোন ঘটনা শুনছি?

বাঘাইছড়ির পাহাড়ে পাহাড়ে নৃশংস ঘটনা ঘটল, তা আমাদের জন্য এক জাতীয় লজ্জা হয়ে রইল। অতীতকে ঈশ্বরও পাল্টাতে পারেন না। তবে প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তিটা অবশ্যই হওয়া কাম্য।

না, এটা ১৯৭১-এর নয়, ২০১০ সালের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অত্যন্ত দুঃখজনক এক ঘটনা। ১৯৭১-এ রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সৈনিকেরা শান্ত বাঙালি গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু ছারখার করে দিত। সেটেলার বাঙালিদের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেভাবে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে আক্রমণ করে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, মানুষ মেরেছে, তাতে একাত্তরের স্মৃতিই সেখানে ফিরে এসেছিল বলে যদি কেউ মনে করেন, তাহলে সেটা কি খুব ভুল হবে?

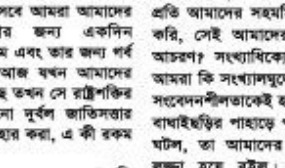

আর এই ফেব্রুয়ারি মাসে? যখন একটা নিপীড়িত জাতি হিসেবে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য একদিন আন্দোলন করেছিলাম এবং তার জন্য গর্ব বোধ করি। অথচ আজ যখন আমাদের নিজেদের রাষ্ট্র হয়েছে তখন সে রাষ্ট্রশক্তির সবল হাতকে কোনো দুর্বল জাতিসত্তার বিরুদ্ধে এভাবে ব্যবহার করা, এ কী রকম ন্যায়বিচার?

পার্বত্য চট্টগ্রামের সহজ-সরল পাহাড়ি মানুষের প্রতি আমাদের আচরণ কখনোই গর্ব করার মতো ছিল না। ষাটের দশকে কৃত্রিমভাবে কাপ্তাই হ্রদ তৈরি করে প্রায় এক লাখ পাহাড়ি জনগোষ্ঠিকে আমরা ভিটেমাটিছাড়া করে সর্বস্বান্ত করেছিলাম। তারপর সমতলের প্রায় চার-পাঁচ লাখ বুদ্ধুক্ষু বাঙালিকে এনে পাহাড়-জঙ্গলে কৃত্রিমভাবে বসিয়ে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের কেবল জনসংখ্যাগত ভারসাম্য নয়, জঙ্গল ও প্রকৃতির সব বৈষয়িক ও নান্দনিক সম্পদও আমরা ধ্বংস করেছি। অনেক রক্তক্ষয়ের পর জাতি যখন আশা করেছিল যে শান্তিচুক্তির একটি সফল বাস্তবায়ন হতে চলেছে, তখন কার প্ররোচনায় এ রকম একটা নৃশংস ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারল তা গভীরভাবে তলস্ত হওয়া দরকার। বাঙালি-পাহাড়িদের এই দ্বন্দ্বে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে। পত্রপত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং ঘটনার যে বাস্তবতা, তাতে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। এ ঘটনার শিকার হয়েছে সেখানকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠী। সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলে এমন হওয়ার কথা নয়। মেজর ফল মেজার নাটকে শেক্সপিয়র একটা কথা বলেছিলেন, এর অর্থ এ রকম যে, শক্তি থাকা ভালো, কিন্তু এর ব্যবহারটা মঙ্গলজনক নয়। শক্তি থাকলেই কি তা ব্যবহার করতে হবে? শক্তির যথেচ্ছা ব্যবহারের অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি, বাংলাদেশ না। সেনাবাহিনীকেও সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের করের অর্থে চলে, সেনাবাহিনীর এমন কিছু করা কাম্য নয় যে তাদের কোনো কার্যকলাপ এ দেশের জনগণকে বিব্রত করে।

পাহাড়ি বাঙালি সমস্যা নিয়ে 'কর্ণফুলির কান্না' নামে একটা ছবি বানাতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। অনেক সহৃদয় পাহাড়ি মানুষের ঘরে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আজ তাঁদের বিষণ্ন ও করুণ মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি গভীরভাবে মর্মাহত হচ্ছি, আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। আমরা বাঙালিরা, যারা আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, পরমতসহিষ্ণুতা ও নিপীড়িত জাতিগুলোর প্রতি আমাদের সহমর্মিতার জন্য গর্ববোধ করি, সেই আমাদের এ কী মধ্যযুগীয় আচরণ? সংখ্যাধিক্যের বর্বরতার জোরে আমরা কি সংখ্যালঘুদের প্রতি সব ধরনের সংবেদনশীলতাকেই হারিয়ে ফেলছি?

বাঘাইছড়ির পাহাড়ে পাহাড়ে নৃশংস ঘটনা ঘটল, তা আমাদের জন্য এক জাতীয় লজ্জা হয়ে রইল। অতীতকে ঈশ্বরও পাল্টাতে পারেন না। তবে প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তিটা অবশ্যই হওয়া কাম্য। আর ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনোই ঘটতে না পারে সে ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, বাঙালি বসতিস্থাপনকারী, উগ্রপন্থী পাহাড়ি, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও সামরিক কমান্ডারসহ সবার কাছ থেকে আমরা আরও অনেক, অনেক বেশী দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল আচরণ প্রত্যাশা করি। কারণ, এ ধরনের বর্বর ও দুঃখজনক ঘটনার কোনো ধরনের পুনরাবৃত্তি এ দেশবাসী আর কখনোই দেখতে চায় না। আমাদের যেন কখনোই আর বলতে না হয় – 'এ তোমার, এ আমার পাপ!'

- সৌজন্যে: প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

লক্ষ্মি বিজয় চাকমার লাশ

গঙ্গারামে পোড়া ঘরবাড়ি

বাঘাইহাটে প্রতিবাদ: ২১ ফেব্রুয়ারী

বুদ্ধপতি চাকমার লাশ

নারীরা ইউএনও-র দিকে তেড়ে আসছেন: ২১ ফেব্রুয়ারী

ইউএনও-র বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদ: ২১ ফেব্রুয়ারী

সাজেকে জান্তব হিংস্রতা

১ম পাতার পর

সেটলাররা চিৎকার দেয়। সেনা সদস্য ও গ্রামবাসীদের তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে আর্মিরা পাহাড়িদের লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। ৮ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত গুলি চলে। গ্রামবাসীরা ভয়ে যে যে দিকে পারে পালাতে থাকে।

এরপর আর্মি ও সেটলাররা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ব্রাশ ফায়ার করতে করতে আর্মিরা পাহাড়িদের গ্রাম গুচ্ছগ্রামে যায় এবং বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের ছোড়া গুলিতে বুদ্ধপতি চাকমা (৩১) স্বামী উত্তম কুমার চাকমা ও লক্ষ্মি বিজয় চাকমা ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বিহারে হামলা

সেটলাররা বালুখাট পূর্বপাড়ায় বনানী বনবিহারেও হামলা চালায়। আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শিষ্য শ্রীমৎ পূর্ণবাস ভিক্ষু বলেন, "বনবিহার গেটে ৩০-৪০ জন চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হয়। আমি তখন বিহারে ছিলাম। বিহারের পাহাড় উঠে তারা নারায়ে তকবির ধ্বনি দেয়। আমি বিহার থেকে বের হলে তারা আমাকে ধমক দেয়। আমি বিহার এলাকা থেকে সরে পড়ি এবং তারা আমাকে ২/৩ শ' গজ পর্যন্ত ধাওয়া করে। আমি বিহারের উত্তরে বাগানে এসে পিছনে ফিরে দেখতে থাকি তারা কি করছে। তাদের হাতে ছিল ধামা। তারা বিহারের জিনিসপত্র বের করে এবং তারপর বিহারে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিহারের মোট ৯টি ঘর পুড়ে যায়। এগুলো হলো বিহারের অতিথিশালা, ভোজনশালা, অষ্টশীলা ঘর, মূল মন্দির, মেশিন ঘর, পাকঘর ২টি, ভিক্ষুদের বাসভবন একটি এবং বিহার সংলগ্ন একটি দোকানঘর।"

বনানী বনবিহার ছাড়াও গুচ্ছগ্রামের জানাক্ষুর বৌদ্ধ বিহার, গঙ্গারামে ১টি গীর্জা, ব্র্যাক পরিচালিত স্কুল একটি ও ইউএনডিপি'র পাড়া কেন্দ্র একটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

হামলাকারীরা আগুন লাগিয়ে দেয়ার আগে ব্যাপক লুটপাট চালায়।

প্রতিবাদ

সাজেকে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বিদেশে ব্যাপক নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল ও এশিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ঘটনার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার দাবি জানিয়ে বিবৃতি দেয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল হতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের বর্তমানে সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সাজেক হামলার প্রতিবাদে ধারাবাহিক কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ২২ ফেব্রুয়ারী কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ ধারণ, ২৩ ফেব্রুয়ারী সড়ক ও নদী পথ অবরোধ, ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন (Candle Light Vigil) ২৫ ফেব্রুয়ারী স্কুল কলেজে ক্লাশ বর্জন ও ২৬ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে গণসমাবেশ। ২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে হামলার পর ১৪৪ ধারা জারি করা হলে ইউপিডিএফ ২৪ ও ২৬ তারিখের কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করে। তবে ২৫ তারিখ স্কুল কলেজ বর্জন করা হয়। তাছাড় পার্টির গণসংগঠনগুলো প্রায় প্রতিদিন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ১৪৪ ধারা জারীর আগ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় ও জেলা সদরে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। জনসংহতি সমিতিও রাঙামাটি শহরে বিক্ষোভ করেছে। তবে তারা বড় ধরনের কর্মসূচী ঘোষণা করেনি।

সড়ক ও জলপথ অবরোধে হামলা, অগ্নিসংযোগ

ইউপিডিএফ-এর ডাকে ২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। রাঙামাটিতে কোন অঘটন ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হলেও খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ-এর একটি মিছিলে হামলা চালায়। দুপুর দেড়টার দিকে নারিকেল বাগান এলাকায় এ হামলা হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। মিছিলটি শাপলা চত্বর থেকে মহাজন পাড়ার দিকে আসতে থাকলে পেছনের দিক থেকে বাঙালিরা আক্রমণ করে। এরপরই হামলাকারীরা নারকেল বাগানে টার্গেট করে পাহাড়িদের দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। তারা মহাজন পাড়া, মিলনপুর, কলেজ পাড়া, সাতভেইয়া পাড়া ও খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় পাহাড়ি ঘরবাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের এই নারকীয় হামলায় উত্তর মহাজন পাড়ায় অফিসসহ ৮টি, দক্ষিণ মহাজন পাড়ায় ১১টি, কলেজ পাড়ায় ৪টি,

উপর ও নীচ: মধুপুর ও সাতকেইয়া পাড়ায় পোড়া ঘরবাড়ি; পাশে: এনজিও কর্মী তপন চাকমা, খাগড়াছড়ি হাসপাতালের কাছে হামলার শিকার।

খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় ৩টি ও সাতকেইয়া পাড়ায় ৪১টি ঘর পুড়ে যায়। এছাড়া ৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাট ও ভাঙচুর এবং সাতকেইয়া পাড়ায় অপর ৪টি বাড়িতে লুটপাট করা হয়।

হামলার সময় পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো। তারা হামলাকারীদের বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করেনি। দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে যেতে চাইলে সন্ত্রাসীরা তাতেও বাধা দেয়। ঘটনা কাভার করার জন্য দায়িত্ব পালনরত এনটিভির সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদ, দেশ টিভির মংলোক মারমা ও সাংবাদিক দিলীপ চৌধুরীকেও মারধর করা হয়। সন্ত্রাসীরা এত কিছু করার পরও পুলিশ রহস্যজনক কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

১৪৪ ধারা, কারফিউ, ধরপাকড়

অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের রাজত্ব শেষ হওয়ার পরই কেবল প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। রাতে জারি করে কারফিউ। পরদিন সকালে খবংপুজ্যাসহ বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় তল্লাশী ও গ্রেফতার পর্ব। ডাক্তার ও শিক্ষকসহ প্রায় ৬০ জন নিরীহ পাহাড়িকে যৌথ বাহিনী আটক করে। খবংপুজ্যায় দুই জনকে মারধর করে আধমরা করে ফেলে যায়। সন্ধ্যার দিকে মিলনপুরে আরও তিন জনকে আটক করা হয়। এরা হলেন বিপুল, ঝন্টু ও মাঞ্চন্যা।

যৌথ বাহিনী নিন্দার ভয়ে হামলাকারীদের কয়েকজনকেও আটক করে। কিন্তু হামলার মূল পরিকল্পনাকারীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর খাগড়াছড়ি ও সাজেক সফর

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক ২৪ ফেব্রুয়ারী সাজেক ও খাগড়াছড়ি সফর করেন। কিন্তু তিনি হামলাকারীদের গ্রেফতারে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না দেয়ায় লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ ও নতুন করে ভীতি ও আতঙ্ক তৈরি হয়। সাজেক ঘুরে এসে খাগড়াছড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: "আমি বাঘাইছড়ি পরিদর্শন করে এসেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার প্রশ্ন, অসহায় মানুষের ঘরবাড়ি কেন পোড়ানো হলো। কেন রক্ষা হলো না তাদের সহায় সম্পদ। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে।"। (প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০)। অথচ বাঘাইহাটে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় তার সামনেই হামলাকারীরা বক্তব্য দেয়, যা পত্র পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

নিরীহ গ্রামবাসীদের গ্রেফতার

খাগড়াছড়ির মতো সাজেক হামলার পরও দোষীদের গ্রেফতার না করে যারা হামলার শিকার, যাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকেই আটক করা হয় ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়। এ কারণে এত বড় অপরাধ করার পরও হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গলার স্বরই চড়া হতে দেখা গেছে। তারা ২৫ ফেব্রুয়ারী তিন জেলায় অবরোধের ডাক দেয়। তার আগে ২৩ তারিখ খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর মিছিলে ৭ম পাতায় দেখুন

১ম বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৭ মার্চ ২০১০ ॥

জাতীয় বার্তা

ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে "উপজাতি" হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা ও রাষ্ট্রের এথনিক ক্লিনজিং পলিসি

মুচিং মারমা

কিছুদিন আগে, ২৮ জানুয়ারী, "উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করার অপতৎপরতা প্রসঙ্গে" শিরোনামে সরকারী এক গোপন প্রতিবেদনে দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোকে "উপজাতি" হিসেবে অভিহিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তিন পার্বত্য জেলার ডিসি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর এই গোপন নির্দেশ জারি করা হয়। এতে বলা হয়, "জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সরকার বরাবরই বলে আসছে যে বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই, কিছু উপজাতি জনগোষ্ঠি রয়েছে মাত্র।" (The country has some tribal population and there are no indigenous people.)

উক্ত গোপন প্রজ্ঞাপন এমন সময় দেয়া হয়েছে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শান্তি, উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের কথা অহর্নিশ বলে বেড়াচ্ছেন। এ নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আদেশ-প্রাপ্ত হয়ে দেয়া হয়েছে, যার অর্থ হলো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সহজভাবে বললে তার নির্দেশেই উক্ত গোপন প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

কিন্তু কেন এই গোপন প্রজ্ঞাপন? কেন দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে অবমাননাকর ও তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত "উপজাতি" হিসেবে অভিহিত করা? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বলা দরকার, ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোকে "উপজাতি" বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবমাননা করার মধ্যে রাষ্ট্রের উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোকে পরাধীন ও উপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য বা তাদের ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠিগুলো বিভিন্ন ধরনের পন্থা ও কলাকৌশল অবলম্বন করে। তারা জানে কেবল পেশি শক্তি বা বন্দুকের জোরে একটি জনগোষ্ঠিকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই জোরজবরদস্তির পাশাপাশি চলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের চেতনার ওপরও প্রভুত্ব বিস্তার করার প্রচেষ্টা, তাদেরকে চেতনাগতভাবে দাসে পরিণত করা। এ জন্য কৌশলী প্রচারণা চালিয়ে পরাধীন জাতির জনগণের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি করা হয়। কারণ কোন একটি জাতি যদি নিজের সম্পর্কে হীনমন্যতায় ভোগে, তাহলে তাকে শাসন করা সহজ হয়। হীনমন্যতায় আক্রান্ত জাতি বা জনগোষ্ঠি কখনো সংগ্রামী হয় না, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় না, নিজের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে সে উপলব্ধি হয় না, সাহসী ও বীর্যবান হয় না এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য লড়াইয়ে কখনোই উৎসাহী হয় না। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠির কাছে "উপজাতি" শব্দটির গুরুত্ব এ কারণেই। "উপজাতি" যেহেতু জাতি নয়, জাতি থেকে অধস্তন, কাজেই তোমাদেরকে বাঙালি জাতির অধীন হয়ে থাকতে হবে -- ওই গোপন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার এই ম্যাসেজটিই দিতে চেয়েছে।

একজন মানুষ নিজেকে যা ভাবে সে তাই। একটি জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রেও এ কথা সর্বাংশে সত্য। তাই, "উপজাতিরা" যদি নিজেদের জাতি হিসেবে ভাবতে শুরু করে তাহলেই তো শাসকগোষ্ঠির জন্য মহাবিপদ। অবশ্য, এই জাতীয় চেতনা ইচ্ছে করলেই কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। একটি জনগোষ্ঠির মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় তখনই যখন সে জনগোষ্ঠির সমাজ তার ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয়। সাধারণতঃ সামন্ত সমাজের অবক্ষয় ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রারম্ভকালে একটি জনগোষ্ঠির মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়।

যে জাতি বা জনগোষ্ঠি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চায় তাকে তাদের ওপর শাসকগোষ্ঠির আরোপিত বিরূপ ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। তা না হলে শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে সংগঠিত ও জড়িত করা যায় না। তাই, চার্লস টেইলর তার পলিটিক্স অব রিকগনিশন গ্রন্থে বলেন, The first task of the colonised and racially oppressed must be to purge themselves of the destructive identity imposed on them by their oppressors. অর্থাৎ উপনিবেশিক ও নির্যাতিত জনগণের প্রথম কাজ হলো তাদের ওপর নির্যাতক জাতির আরোপিত ক্ষতিকর পরিচিতিগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। এই কাজটা করা সম্ভব হলে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্য অর্ধেক পূরণ হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে "আদিবাসী" শব্দটি সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা দরকার। সরকার একদিকে দেশে "আদিবাসী" নেই বলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার করে বেড়ায়, অপরদিকে তার মন্ত্রী এমপিসহ আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে "আদিবাসী" বলে আখ্যা দেয়। আবার দাপ্তরিকভাবে বা অফিসিয়ালি সরকার তাদেরকে "উপজাতি" হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। আদিবাসী শব্দটির যথেষ্ট প্রচলন হলেও, নিজেদেরকে "আদিবাসী" হিসেবে পরিচয় দেয়ার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। তাছাড়া, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জাতি বা জাতিসত্তার বিকল্প হিসেবে আদিবাসী শব্দটির ব্যবহার যথার্থ নয়। বিশেষণ হিসেবে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হলে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না -- যেমন আদিবাসী জাতিসমূহ বললে বোঝা যায় তারা অন্যরা আসার আগে নির্দিষ্ট ভূমিতে বসবাস করছিলেন। কিন্তু "আদিবাসী" শব্দটি জাতি বা জাতিসত্তার বিকল্প হতে পারে না। বর্তমানে "আদিবাসী" শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে শব্দটির মধ্যে এমন ব্যঞ্জনা তৈরি হয় যাতে মনে হতে পারে যে, যে জনগোষ্ঠিকে "আদিবাসী" হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে সে জনগোষ্ঠি অপরিবর্তনীয় স্থির কোন এক সত্তা। এতে সমাজ বিকাশের নিয়মকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। কারণ কোন জাতি বা জনগোষ্ঠি কখনোই স্থির অপরিবর্তনীয় নয়। দ্বিতীয়ত, আদিবাসী শব্দটিকে রাজনৈতিক অভিধা হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় না; বরং এর মধ্যে সাংস্কৃতিক বর্ণ হিসেবে পরিচয় পাওয়ার ঝোঁকই বেশী। সে জন্য "আদিবাসীরা" অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে কখনোই রাজনৈতিক সংগ্রামের উচ্চস্তরে নিয়ে যান না। তারা একে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেন -- তথাকথিত আদিবাসী মেলা ও উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে। (বর্তমানে এই আদিবাসী মেলাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান)। অথচ যে কোন জনগোষ্ঠির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলো প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে নিছক সাংস্কৃতিক মেলায় নামিয়ে ফেলা চরম মূঢ়তারই পরিচায়ক।

জাতি ও উপজাতির মধ্যে সম্পর্ক কখনোই সম মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে কারণে তাদের মধ্যে কখনোই প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি বা জনগোষ্ঠি -- ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক -- প্রত্যেকে সমানাধিকার ও সমমর্যাদা ভোগ করবে সেটাই স্বাভাবিক। একটি জাতি যে অধিকার ভোগ করে অন্য একটি জাতিও সেই একই অধিকার ভোগ করবে এবং কোন জাতির বিশেষ অধিকার থাকবে না, কোন জাতি অন্য কোন জাতির ওপর প্রভুত্ব করবে না -- এটাই হলো গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতিগুলোর মধ্যে ঐক্য ও মহামিলন ঘটানোর একমাত্র পথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ভাষায়: আমরা সবাই রাজা আমাদের রাজার রাজত্বে, নইলে মোরা রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে?

একটি দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে জাতিগুলোর বিকাশ সমান নাও হতে পারে। অর্থাৎ জাতিগুলো তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে থাকতে পারে। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো পশ্চাদপদ জাতিগুলোর বিকশিত হওয়ার পূর্ণ অধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে বাগানের মালির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মালি যেমন বাগানের প্রত্যেক গাছের পরিচর্যা করে এবং বিশেষত দুর্বল ও কচি চারা গাছগুলোর বেশী করে যত্ন নিয়ে থাকে, বিভিন্ন জাতির বিকাশে সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজও হলো অনেকটা তেমনই।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র মোটেই গণতান্ত্রিক নয় এবং এদেশে বসবাসরত জাতিগুলো সমানাধিকার ভোগ করে না। বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের কোন স্বীকৃতি নেই এবং এখনো দেশে তাদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা হয়। বস্তুত স্বাধীনতার পর থেকেই ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিলীন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি না দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ন, সেটলার পুনর্বাসন, একের পর এক গণহত্যা চালানো, ভূমি বেদখল, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের এথনিক ক্লিনজিং নীতির সাথে সম্পর্কিত। "উপজাতি" আখ্যায়িত করার নির্দেশনামা যে উপরোক্ত পদক্ষেপের নতুন সংযোজন তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সরকারের উক্ত নির্দেশনামা বা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হয়েছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় শাসক গোষ্ঠীভুক্তি দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উচিত নিজেদের জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানত নিজেদের পার্টি ও শক্তির উপর নির্ভর করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করা। অবশ্য সাফল্যের জন্য তাদের এই সংগ্রাম দেশের অপরাপর শোষিত ও নিপীড়িত ব্যাপক বাঙালি জনগোষ্ঠি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগুলোর সংগ্রামের সাথে যুক্ত হতে হবে। কারণ বর্তমান যুগে একটি দেশে নিপীড়িত জাতি ও জনগণ আলাদাভাবে সংগ্রাম করে মুক্ত হতে পারে না। অপরদিকে, নির্যাতক জাতির শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনগণও তাদের দেশে বসবাসরত নিপীড়িত জাতির জনগণকে মুক্ত না করে নিজেরা শোষণ নির্যাতন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মুক্ত হতে পারে না। তাই উভয়ের মুক্তির জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।■

সেনাবাহিনীর গুণকীর্তন: সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

সাজেকে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারীর হৃদয় বিদারক ঘটনা দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন যে কেউ এই রোমহর্ষক বর্বর হামলার নিন্দা না জানিয়ে পারে না। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যালসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলো কড়া ভাষায় এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘও পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে বিবৃতি দিয়েছে। ভারত, শ্রীলংকা, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে প্রবাসী পাহাড়িরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এই বিক্ষোভ এখনো অব্যাহত আছে।

অথচ এই সাজেক ঘটনাকে দেশের কিছু পত্রিকা ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যেভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছে তা এক কথায় ভয়াবহ। প্রথমত, তারা পাহাড়িদের উপর পরিকল্পিত হামলা ও হত্যার ঘটনাকে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ বলে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালায়। এতে তারা নানা রঙের মিথ্যা ও আজগুবি তথ্য হাজির করে। দ্বিতীয়ত, তাদের বক্তব্য হলো কিছু দিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার কারণে সেখানে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত বিএনপি ও জামায়াত নেতা ও তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের মুখ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে সেনা-প্রেম যেন উথলে উঠেছে। এভাবে যারা কথা বলছেন তারা অনেকে বিগত সেনা-নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। তখন তারা সেনাবাহিনীর মুণ্ডুপাত ও চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছেড়েছিলেন। কিন্তু আজ সাজেক ঘটনার পর এই সব হিপোক্রাইটদের সুর সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাদের বক্তব্যের অর্থ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো: সেনাবাহিনী তখনই খারাপ যখন তারা আমার ওপর অত্যাচার করে; কিন্তু সেনাবাহিনী ভালো ও দেশপ্রেমিক যদি তারা নিরীহ পাহাড়িদের ওপর অত্যাচার চালায়। সেনাবাহিনী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠুনকো অজুহাতে ছাত্র পেটায় তখন খারাপ; আর যখন তারা কোনো কারণ ও অপরাধ ছাড়াই প্রতিদিন পাহাড়িদের ওপর অত্যাচার চালায়, হয়রানি করে, গুলি চালিয়ে খুন করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, অন্যায়ভাবে আটক করে, রাতে বিরাতে গ্রাম ঘেরাও করে, লোকজনের বাড়িতে তল্লাশী চালায়, মেয়েদের ধর্ষণ করে, ধর্মীয় গুরুদের হয়রানি করে, বিহার ভেঙে দেয়-পুড়ে দেয়, তখন তারা ভালো ও দেশপ্রেমিক। এই কিম্ভূতকিমাকার "সেনা-প্রেমীরা" দেশে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সামরিক শাসনের বিরোধী; কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী ও সামরিক শাসন জারী রাখার জোর পক্ষপাতী। এদের মানসিক বিকৃতিকে চিহ্নিত করার জন্য ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে -- Sadist. এর বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা আমার জানা নেই। শব্দটির অর্থ হলো অন্যের ওপর পীড়ন চালিয়ে মানসিক সুখ লাভ করা।

এই অপরিণামদর্শীদের জন্য বলা দরকার, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যেসব সেনা নায়ক দেশে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাজনীতিবিদসহ অন্যান্যদের ধরে ধরে জেলে পুরে রেখে ও নানাভাবে নির্যাতন করেছে তাদের প্রত্যেকের হাতে খড়ি হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে। যারা আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ মানুষ জনের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে তাদের হাত ও অস্ত্র একদিন আপনাদের দিকেও ঘুরতে পারে। যে মা-বাবা তার অবাধ্য ছেলে অন্যের কাছ থেকে চুরি করলে কিংবা অন্যের ওপর দোষ করলে খুশী হয় ও তার পক্ষ নেয়, সে মা-বাবা হওয়ারও অযোগ্য এবং সে ছেলে একদিন অমানুষ হয়ে তার মা-বাবার মুখ কলঙ্কিত তো করবেই, তদুপরি সে তাদের নানাবিধ দুঃখ ও এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। তাই সাবধান! ■

জাপান: The World Jumma Voice of Japan, Jumma People Network of Japan ও Jumma Net নামে তিনটি সংগঠন ২৫ ফেব্রুয়ারী টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা সাজেক-এ পাহাড়ি গ্রামে সেনা সেটলার হামলার নিন্দা জানায় ও তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দাবি করে। ৫০ জনের অধিক এই বিক্ষোভে অংশ নেয়। এর আগে তাদের একটি মিছিল তিন কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে। তারা দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করে।

ভারত: ২৫ ফেব্রুয়ারী নতুন দিল্লীতে CHTs Support Group-India ব্যানারে ২ শতাধিক পাহাড়ি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। বিক্ষোভে সেনা ও সেটলার প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবি জানিয়ে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড দেখানো হয়। কলকাতা, ত্রিপুরা ও মিজোরামেও বিক্ষোভ হয়েছে।

ভারত, ত্রিপুরা: ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় চাকমা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের বিক্ষোভ। ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০। ১,২০০ নারী পুরুষ ও ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেন।

শ্রীলংকা: কলম্বোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে ভিক্ষুদের বিক্ষোভ। ৩ মার্চ ২০১০। এর আগের দিন তারা এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেন।

ঢাকা: সাজেক হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ। ২৬ ফেব্রুয়ারী। রাজধানী ঢাকায় বসবাসরত সহস্রাধিক পাহাড়ি নর-নারী ও ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেন। পরে একটি মিছিল বের করা হয়।

চট্টগ্রাম: সাজেক হামলার প্রতিবাদে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম ছিল বিক্ষোভে উত্তাল। ইউপিডিএফ -ভুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম আহুত প্রতিবাদ মিছিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ অনেকে অংশ নেয়।

সাজেকে জান্তব হিংস্রতা

৫ম পাতার পর

হামলা ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ২০ তারিখ সাজেক ঘটনার পরও তাদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আস্কারা দেয়ার ফল হলো খাগড়াছড়িতে ২৩ তারিখের সাম্প্রদায়িক হামলা। প্রশাসন কোনভাবেই তার দায় এড়াতে পারে না।

সাজেকে হামলাকারীদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না এ রকম প্রশ্নের জবাবে রাঙ্গামাটির পুলিশ সুপার মাসুদ-উল-হাসান বলেন, "মামলা হলেই যে গ্রেপ্তার করা হবে, তা তো নয়।" - দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০। অথচ অর্মি ও পুলিশ মামলা হওয়ার আগেই বাঘাইছড়িতে ৭ জন পাহাড়িকে আহত অবস্থায় আটক করে। তাদের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ। প্রশাসনের এ রকম পক্ষপাতদুষ্টক, সাম্প্রদায়িক ও দ্বৈত আচরণ পাহাড়ে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বাধা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খাগড়াছড়ির এক শিক্ষক বলেন, যত দিন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকবে ততদিন সেখানে শান্তি আসবে না। দেশে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, তত্ত্বাবধায়ক - যে রঙ্গের সরকারই ক্ষমতায় আসুক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে সব সময় এক ধরনের সরকারই থাকে; আর তা হলো -- সেনাবাহিনীর সরকার। তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই সব কিছু। তারা পাহাড়িদেরকে এ দেশের নাগরিক বলেই গণ্য করে না। গণ্য করে "দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি"। তা নাহলে এভাবে কেউ মানুষকে গুলি করতে পারে? সমগ্র দেশের স্বার্থে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

ন্যায় বিচার হবে কি?

দেশে বিদেশে ব্যাপক নিন্দা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের পরও সরকার এখনও তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। তাহলে কি দোষীদের শাস্তি হবে না? ১৯৯৬ সালে কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস-এর মতো বাঘাইছড়ি জোনের ওয়াসিম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাও কি পার পেয়ে যাবে? এদেশে পাহাড়িরা কি ন্যায় বিচার পাবে না? ঘটনার পর খাগড়াছড়ি রিজিয়নের অধিনায়ক জেনারেল এম এম সালেহীন বলেছেন: "সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর ওপর গুলি চালালে আত্মরক্ষার জন্য সেনাসদস্যরা তিনটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। বাকি গোলাগুলি কারা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।" তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটনায় সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে। সরকার ও সেনাবাহিনী যদি নিজেদের নির্দোষ ও পুতপবিত্র মনে করে তাহলে তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষীদের শাস্তি দিতে এত অনীহা কেন?

যুক্তরাষ্ট্র: সাজেক-এ সেটলার হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে প্রবাসী Jumma-দের বিক্ষোভ। ১ মার্চ ২০১০।

যুক্তরাজ্য: সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল ও Jumma Peoples Network-UK ২৪ ফেব্রুয়ারী লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

অস্ট্রেলিয়া: অস্ট্রেলিয়ায় সিডনি ও আদেলেইড-এ প্রবাসী Jumma-দের পৃথক দু'টি বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। বাম পাশের ছবিতে সিডনি প্রবাসী Jummaরা সাজেক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন: তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারী। ডানের ছবিতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার শহর আদেলেইড (Adelaide)-এ প্রবাসী Jumma-দের প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়া: Jumma Peoples Network-Korea ২৪ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সহযোগিতায় সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করে। জেপিএন-কে'র নেতা কর্মিরা মাথায় কালো ব্যান্ডেজ পরে ও কালো ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে সাজেক হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদ জানায়। পুলিশের বিশাল একটি দল ব্যারিকেড দেয় ও দূতাবাসের কাছাকাছি যেতে বাধা দেয়। পুলিশী বাধার মুখে ধীমান ত্রিপুরা ও ছোটি চাকমার পরিচালনায় জেপিএনকে-এর সাবেক সভাপতি শান্তি জীবন চাকমা ও কোরিয়া সোসালিস্ট পার্টির সভাপতি Choi Kwang Eun বক্তব্য রাখেন। তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবি জানান এবং ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী সাজেক হামলার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ জেপিএনকে-এর সেক্রেটারী জেনারেল রনেল চাকমা, সদস্য নেটিভ চাকমা ও ছোট চাকমা এবং কোরিয়া সোসালিস্ট পার্টির সভাপতি Choi Kwang Eun ও Buddhist solidarity for Reform (BSR) এর সদস্য সন-কে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে অবশ্য তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। সোসালিস্ট পার্টি ও বিএসআর ছাড়াও মানবাধিকার সংগঠন Imagination for International Solidarity (IFIS), Korean House for International Solidarity (KHIS) ও PNAN উক্ত প্রেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে। (মধ্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ সোসালিস্ট পার্টির সভাপতিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। ডানের ছবিতে পুলিশ পরিবেষ্টিত রনেল ও জেপিএনকে'র সদস্যরা)